নারীর গৃহস্থালি ভূমিকা ও বঞ্চনা
বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

চিররঞ্জন সরকার

আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে আমাদের পরিবারে তথা সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কবিগুরু লিখেছিলেন,

'এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি!
. . . . . .
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা'

(*মুক্তি, পলাতকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*)

সেই রান্না আর খাওয়া থেকে অর্থাৎ গৃহস্থালি ভূমিকা থেকে নারী এখনো তেমনভাবে বের হয়ে আসতে পারে নি। যারা উপার্জনমূলক পেশায় নিয়োজিত তাদেরও ঘরে এসে ঠিকই গৃহস্থালি ভূমিকা পালন করতে হয়। বাল্যকাল থেকেই আমাদের নারীরা বঞ্চিত। এর জন্য দায়ী যুগ যুগ ধরে চলে আসা আর্থ-সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও আচরণ। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার অনুষ্ঠান। জন্ম থেকে মেয়েদের জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়, তথা তাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য পর্যন্ত তারা বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়। জন্মের পর থেকেই সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ ও অধিকারগুলো মেয়েশিশুদের ত্যাগ করতে শেখানো হয়। প্রথম থেকেই তারা শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। অমোঘ নিয়তির মতো আরো আসে সহিংসতা ও নির্যাতন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান পুরুষের বহু নিচে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার গ্যাপ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান অসীম। কিন্তু জাতীয়ভাবে নারীর অবদানের কোনো মূল্যায়ন নেই। প্রচলিত জাতীয় আয় (জিডিপি) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষের উৎপাদনশীলতার প্রায় ৯৮ শতাংশ যেখানে হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীর উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭ শতাংশ গণনা করা হয়। গৃহস্থালির কাজ প্রায় এককভাবে নারীরাই সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু কোথাও নারীর অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয় না। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করে। কিন্তু ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র ভোগ করে এবং মোট সম্পদের ১ শতাংশেরও কম অংশের তারা মালিক[১]। উৎপাদনশীল পরিমণ্ডলে নারীকে সবসময়ই অনুৎপাদনশীল এবং কেবল ভোগকারী হিসেবে মনে করা হয় বলেই তাদের এই অবস্থা। অথচ নারী সমানভাবে ভোগকারী এবং উৎপাদনকারী। গৃহকর্মের স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ হিসেবে নারীকে বেকার এবং নিষ্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। এ কারণে দেশের ১০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশকে 'গৃহবধূ' বা 'ঘরনি' নামে আখ্যায়িত করে

[১] সংবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১

তাদের রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে[২]।

নারীরা ঘরে এবং ঘরের বাইরে যে কাজ করে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে যদি তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য সকল কাজ বন্ধ করে দেয়। নারীরা তাদের অক্লান্ত শ্রমের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে যে অপরিমেয় অবদান রেখে চলেছে, তার সঠিক মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করা একান্তই জরুরি।

পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নারীর অধস্তনতা

আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে। এ ধরনের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অধস্তনতা ও কর্তৃত্ব, নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। সমাজপতিরা যেহেতু পুরুষ তাই পদে পদে তারা নিত্যনতুন ব্যবস্থাপনায় সমাজে নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীও সেই মূল্যবোধ ধারণ করে এবং নিজস্ব জীবনাচরণে তা চর্চা করে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়। এই মূল্যবোধ পুরুষকে আশ্রয়দাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নারীকে 'অক্ষম' ও 'অবলা' হিসেবে চিহ্নিত করে। সামাজিক জীবনের অধিকাংশ সম্পদের নিজস্ব হক থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্মানের অধিকারী হয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সম্ভাবনা থেকে তারা নির্বাসিত। শ্রেণি জাতপাত, ধর্মীয় সম্প্রদায় অনুসারে সামাজিক অবস্থানের বেশ খানিকটা হেরফের হলেও দ্বিতীয় সারির অবস্থান থেকে তারা কখনো মুক্ত হতে পারে না।

এভাবে অসমতার ভিত্তিতে নিরূপিত সম্পর্কের কারণে নারী হয় বঞ্চিত, নিগৃহীত ও শোষিত। সমাজ নারীর চরিত্রে কিছু ভাবমূর্তি আরোপ করে তাদের নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, সংসারে ক্লান্তিহীন শ্রমদানকারী, ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরিপূর্ণ চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করে। গৃহস্থালি ক্রিয়াকর্মে, গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে, উৎপাদনশীলতায় নারীর ভূমিকা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় না। এভাবে ব্যয়িত শ্রম সরাসরি টাকায় রূপান্তরিত হয় না বলেই সাধারণত নারীর শ্রমদানের স্বীকৃতি আসে না। সন্তান জন্মদান ও লালনের মধ্য দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে, তারও যথাযথ স্বীকৃতি নেই। বরং, তার এই অবদান শক্তিতে রূপান্তরিত না-হয়ে দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়।

পুরুষ সমাজে তার প্রয়োজন পূরণে তৈরি করেছে বিভিন্ন মূল্যবোধ। নারীশিশুর জন্য খেলনা থেকে শুরু করে তার পোশাক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, চলাফেরার ধরন, কথা বলার ঢং, পেশা সবকিছু সম্পর্কেই মূল্যবোধ তৈরি করা হয় এই প্রয়োজন পূরণকে সামনে রেখে। পিতৃতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে যে মূল্যবোধ তৈরি করা হয়, সেখানে নারী হচ্ছে অধস্তন, পুরুষ বিনা যার কোনো গতি নেই। তাই জন্মমাত্রই নিকৃষ্ট ভেবে মেয়েশিশুকে ছুড়ে দেয়া হয় বৈষম্যমূলক অবস্থানে। আবার এই বৈষম্যকে পাকাপোক্ত করতে নারী যাতে তা মেনে নেয়, সেজন্য বৈষম্যের অনুকূলে তৈরি করা হয় মূল্যবোধ। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানে নারীর অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় ভাবা হয়, যাতে করে নারী নেতৃত্বপ্রদানে পুরুষের সমান ভাগিদার হতে না-পারে। নারী যেন কোনো মতেই স্বাবলম্বী হতে না-পারে সেজন্য নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং পছন্দমতো পেশা বেছে নিতে দেওয়া হয় না। সেইসঙ্গে নারী যাতে সম্পদশালী না-হতে পারে, সেজন্য যতটুকু সম্পত্তি তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, ততটুকুও গ্রহণ করা অনুচিত বলে প্রচার করা হয়। নারীর স্বাবলম্বন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো মূল্যবোধ তৈরি করা হয় না। বিরাজমান মূল্যবোধ তাই নারীকে আর্থিক ও মানসিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। ফলে মূল্যবোধের দুষ্টচক্রে পাক খেতে খেতে নারী অধিকার, মর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

নারীর যৌনতা এবং নারীর শ্রম, এই দুই-ই তার একান্ত নিজস্ব হলেও এসবের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কম। অর্থাৎ সন্তান ধারণের যে অসামান্য ক্ষমতা জৈবিক নিয়মে নারীর একান্ত নিজের, সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে ওঠার কারণে সেই নিজস্ব ক্ষমতাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পুরুষ শাসকের কুক্ষিগত করা হয়েছে। এই কুটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার দিকে আঙুল তুলেই এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'World historic defeat of the female Sex' অর্থাৎ বিশ্বের ইতিহাসে নারীজাতির চরমতম পরাজয়। এরই উৎস খুঁজতে গিয়ে এঙ্গেলস সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, কেবল ব্যক্তিগত মালিকানাতেই নয়; রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পরিবারের গাঁটছড়াতেও একইসঙ্গে বাঁধা পড়ে নারীর শ্রম। নারীর সামাজিক পরিচয় নির্ণীত হয় কেবল তার পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা দিয়ে, যাকে সুসংহত করে রাখার জন্য তৈরি হয় পরিবারের চার দেয়াল। তার শ্রমের যে উৎপাদিকা শক্তি, তার ওপরে চেপে বসে পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসন। অর্থাৎ একমাত্র পুরুষের শ্রমই

[২] চিররঞ্জন সরকার, নারী ও দারিদ্র্য, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০৯

সমাজে স্বীকৃত পারিশ্রমিকের অধিকারী। রোজকার রান্নাবান্না পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউই বড়ো একটা করে না। কিন্তু তার কোনো আর্থিক মূল্য নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ভোজে কিংবা কোনো হোটেলে পুরুষেরা রান্না করে, তার মূল্য ধরা হয় মোটা টাকার অঙ্কে। নারীর শ্রম সরাসরি টাকায় রূপান্তরিত হয় না বলেই সাধারণত নারীর শ্রমদানের স্বীকৃতি আসে না। সন্তান জন্মদান ও লালনের মধ্য দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে, তারও যথাযথ স্বীকৃতি নেই। বরং, তার এই অবদান শক্তিতে রূপান্তরিত না-হয়ে দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়।

তাছাড়া যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণে আমরা বসবাস করি, যে ভাষা এ সংস্কৃতির মূল, তার সবটাতেই পুরুষের প্রধান্য। পুরুষের নারীকে আড়াল কবার উপযোগী একটি আধিপত্যবাদী ও যৌনগ্রাসী ভাষাও রয়েছে। এমনকি নারী যে সাংস্কৃতিক কাজে ব্যাপৃত হয়, তার মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক, পুরুষের সন্তুষ্টিই তার পরিণতি। পুরুষতন্ত্র নারীর ব্যক্তিত্বকে সম্মান না-করে পুরুষকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ করে দেখার যে মানসিকতার জন্ম দিয়েছে, সেই অসুস্থ মানসিকতা নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখে ও তার দেহ ও মনের ওপর করে বেপরোয়া খবরদারি।

গৃহস্থালি কাজের বাইরে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো নারীকে অন্য কোনো ভূমিকায় দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে নি। প্রথাগত ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত মানুষ নারীকে রাজনীতির মঞ্চে দেখলে হোঁচট খায়। নানাভাবে তার গতিপথ আটকে দিতে চায়। তারপরও যারা এগিয়ে যেতে চায় তাদের নামে নানারকম কুৎসা রটনা করা হয়, চারিত্রিক স্খলন নিয়ে মুখরোচক সব কাহিনি প্রচার করা হয়। সাধারণ মানুষ, এমনকি নারীরা পর্যন্ত তা বিশ্বাস করে। এতে করে সম্মান নিয়ে কেউ সামাজিক-রাজনৈতিক ময়দানে অবাধে বিচরণ করতে পারে না।

জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন

সম্পত্তির উত্তরাধিকারপ্রথা থেকে শুরু হয় নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য। এরপর পারিবারিক শ্রমবিভাজনপ্রথা তাদের আরো বেশি বঞ্চনার মুখে ঠেলে দেয়। পুরুষরা ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে শুধু মাঠের কাজ বা বাইরের কাজ করে। গৃহস্থালি কাজে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। অথচ সেই নারীকেই পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘরের ও বাইরের সব কাজে সমান ভূমিকা পালন করতে হয়। পুরুষ শুধু বাইরের কাজ করবে— এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা সমাজে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষরা সাধারণত ঘরবাড়ির কাজ (বাসনকোসন ও কাপড়চোপড় ধোয়া, উঠোন-ঘর পরিষ্কার করা, তরকারি কাটা, মসলা বাটা ও রান্না করা, বাচ্চার যত্ন নেয়া ইত্যাদি) খুব একটা করে না। কিন্তু নারীদের ঘরে ও বাইরে সবখানেই কাজ করতে হয়। কর্মজীবী নারীরাও গৃহস্থালি কাজ থেকে রেহাই পায় না। এ ব্যাপারে একজন নারীর লেখা অসাধারণ এক অনুভূতির তর্জমা উল্লেখ করা যেতে পারে—

অফিস থেকে বাসে চেপে ফিরে এসে বাড়ি
তড়িঘড়ি পালটে শাড়ি, চুলায় বসাই হাঁড়ি
কর্তা বসেন পেপার নিয়ে, চায়ের কাপটি হাতে
হেঁকে বলেন, 'শুনছ, আজ মাংস খাব রাতে।'
কুটনা কুটে ফ্রিজে দেখি মাংস তো নেই আর
মাথায় বাড়ি, পালটে শাড়ি চললাম বাজার
ফিরে এসে রান্না চড়াই, খোকা পড়াই, সময় বয়ে যায়
মাঝে মাঝে উদাসী মন অতীত পানে ধায়।
রাত দশটায় খাবার বেড়ে কর্তাকে দেই ডাক
প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলে কুচকে তিনি নাক
বলেন, 'কি যে রাঁধ অখাদ্য সব, খাবই না আজ রাতে—
আহা, মায়ের রান্না অমৃত সে জুটবে কি আর পাতে!'
সাধি তারে হাতটি ধরে, 'একটু তো খাও, ডিম ভেজে আনি'
বেড়ে খাওয়াই, খোকা সামলাই, মুছে চোখের পানি
গভীর রাতে নির্ঘুম চোখ, কর্তা ঘুমান পাশে
ভাবি, এই কয়েদে কয়েদ আমি কোন সে সুখের আশে?
ভেবে ভেবে প্রহর ফুরায়, না পাই কোনো তল
নেই যে আমার দিনবদলের সাহস কিংবা বল
আমার মায়ের জীবনখানিও এমনি তো ছিল
লিখে পড়ে চাকরি করে এমন কি বদলালো?

আসলে বদলটা তেমনভাবে হয় নি। বিশেষ করে আমাদের পুরুষদের মানসিকতার। আমাদের দেশের বেশিরভাগ নারীর

জীবনে পরিশ্রমের বোঝাও তাই খুব একটা কমে নি। গৃহস্থালি কাজ থেকে শুরু করে মাঠের কাজ— সবরকম কাজই তারা করে থাকে। কিন্তু গৃহস্থালি কাজকে স্বামী বা পুরুষরা কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। পুরুষরা মনে করে, ভারী কাজ বা অধিক শক্তির কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। কারণ তাদের শক্তি কম। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাও পুরুষদের এই চাপিয়ে দেওয়া ধারণা বিশ্বাস করে। আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজের বিভাজন অনেক কাল আগে থেকেই চলে আসছে। এটা বর্তমানে সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। এটা এমনই বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছে যে, এর পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা কেউ অনুভব করে নি, করতে চায়ও নি।

গৃহস্থালি কাজে গ্রামীণ নারী

গৃহস্থালির সমুদয় দায়ভার সামলানো নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই গৃহস্থালি কাজে নারীদের একটা বড়ো অংশ নিয়োজিত এবং নারীরা তাদের কর্মসময়ের বড়ো একটা অংশ এই কাজে ব্যয় করলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অধিকাংশ গ্রামীণ নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদন বা বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন। তারা জাল ও মাদুর বোনেন, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরি করেন, মুড়ি, পিঠা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন এবং আয়-উপার্জনের সঙ্গে সংযুক্ত নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকেন।

বাংলাদেশের বসতবাড়িতে পশুসম্পদ (হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষত গোয়ালঘর নির্মাণ, পরিষ্কার করা, পশুদের খাওয়ানো, পরিচর্যা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৪৪-৮৫ শতাংশ। অপরদিকে এক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণের হার শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ। বসতবাড়িতে 'সবজি বাগান' করার মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের নারীরাই তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে বসতবাড়ির সবজি বাগান থেকে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা ৯০-১০০ শতাংশ মিটিয়েও পরিবারের অতিরিক্ত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫-৩০ শতাংশ অবদান রাখছেন। আইএলও'র এক সমীক্ষায় প্রকাশ 'নারীর মোট গৃহস্থালি শ্রম যোগ করলে তা অনেক দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক হবে'। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, আত্মপোষণশীল খাতে অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে গৃহবধূ বাদে পরিবারের সবাই গড়ে বছরের ১০০ দিন ব্যয় করে থাকে, পক্ষান্তরে গৃহবধূরা এক্ষেত্রে ব্যয় করে ২০০ দিন। আত্মপোষণশীল খাতে ব্যয়িত মোট বার্ষিক সময় ৬৯০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা। পুরুষ কর্তৃক ব্যয়িত সময় ২৫০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা, নারী কর্তৃক ব্যয়িত সময় ৪৪০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা[৩]। প্রাকৃতিক নিয়মে আবহমানকাল থেকে নারী সন্তান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। পাশাপাশি সন্তানকে লালনপালনের কাজটিও নারীকেই করতে হচ্ছে। এই দুটো কাজ করতে গিয়ে নারী তার জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময় (১৫-৪০) ব্যয় করছেন। অথচ এর কোনো স্বীকৃতি পাচ্ছেন না।

কৃষিকর্মে গ্রামীণ নারী

বিশ্বের অর্ধেক নারী উন্নয়নশীল বিশ্বে বাস করে। তারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে এবং সকল প্রকার কৃষি উৎপাদনের ৪০-৮০ শতাংশ (দেশ অনুসারে ভিন্ন) দায়িত্ব পালন করে। এশিয়া মহাদেশে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ শ্রম নারীরা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ধান গোলায় তোলা, ধান বীজ সংরক্ষণ করা, খাবারের জন্য শস্য ভাঙানো ও পরিষ্কার করা, পাটকাঠি থেকে আঁশ ছাড়ানো, পশু ও হাঁস-মুরগির যত্ন নেয়া, শাকশবজি চাষ ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে নারী সরাসরি সম্পৃক্ত। কৃষিকর্মে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে তাদের কাজের মূল্যায়ন হয় না। বাংলাদেশে মোট গ্রামীণ নারীর ৭৬.৬ শতাংশ কৃষিখাতে কাজ করে[৪]। সময়ের পরিমাপে ও গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব কোনোভাবেই পুরুষের চেয়ে কম নয়। কৃষি উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে বিশ্লে ষণ করলেই এ সত্য ধরা পড়ে—

১. প্রাক-বপনপ্রক্রিয়া : এটি মূলত নারীর কাজ। এ পর্বের কাজ বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বীজ বপনের প্রস্তুতি;
২. বপন ও ফসল উৎপাদনপ্রক্রিয়া : এটি মূলত পুরুষের কাজ। এ পর্বের কাজ জমিতে চারা রোপণ ও তা তোলা (অঞ্চলভেদে মেয়েরাও তা করে থাকে);
৩. ফসল-উত্তোলনপ্রক্রিয়া : এটি প্রায় এককভাবে নারীর কাজ। এই পর্বের কাজ হলো ধান মাড়াই, ধান বাছাই, শুকানো, ধান ভানা ও ঝাড়া।

---

[৩] গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান, ডবি- উবিবিট্রাস্ট-হেলথব্রিজ, ২০০৮

[৪] সমকাল, ৮ মার্চ, ২০১১

সারণি ১ : বাংলাদেশে একজন গ্রামীণ নারীর জীবনে একটি বছর[৫]

মাস	কাজ
বৈশাখ (১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে)	পুকুর থেকে মাটি আনা, শাকশবজি লাগানো, পানি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার ও মাচার ব্যবস্থা করা, নানা ধরনের আমের আচার বানানো
জ্যৈষ্ঠ (১৫ মে থেকে জুন)	আমসত্ত্ব তৈরি, তরিতরকারি চাষাবাদ
আষাঢ় (১৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই)	মাছ ধরার জাল ও ফাঁদ বানানো, মাছের পোনা তৈরি, কাঁথা, মাদুর ও কাপড় সেলাই, পাটের শিকা প্রস্তুত করা
শ্রাবণ (১৫ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট)	ধান মাড়াই, পরিষ্কার, সেদ্ধ ও শুকানো এবং ধান ভানা, গরুর খাদ্যের জন্য নাড়া শুকানো ও গাদা করা, শীতল পাটি বানানো
ভাদ্র (১৫ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর)	বর্ষাপরবর্তী স্যাঁতসেঁতে ও ছাতা পড়া ঘরদোর পরিষ্কার, পরবর্তী ফসলের জন্য ধানের গোলা মেরামত, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত
আশ্বিন (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর)	জ্বালানি সংগ্রহ, ফসল পরিচর্যা, গবাদিপশুর যত্ন, কাঁথা সেলাই
কার্তিক (১৫ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর)	নাইওর যাওয়া, শাকশবজি ও কালাই বোনা
অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)	ধান ভানা ও চাল জমা করা, পিঠা তৈরি
পৌষ (১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি)	নতুন ধানের চালের পিঠা তৈরি, মুড়ি ও চিড়া তৈরি
মাঘ (১৫ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেরুয়ারি)	খেজুর গুড় তৈরি ও পিঠা বানানো
ফাগুন (১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ)	ঘরদোর ঠিকঠাক করা, মাটি তুলে ঘরের মেঝে উঁচু করা ও লেপা, শবজি আবাদ, সরিষা তোলা
চৈত্র (১৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল)	ঘরদোর পরিষ্কার ও মেরামত, শবজি বোনা, তালপাতার পাখা তৈরি

[৫] ইউনিসেফ, ২০০৩

গ্রামীণ নারী কৃষি উৎপাদন ও নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতিহীনভাবে অবদান রেখে চলেছে। সারা বছরের প্রায় প্রতিদিনই তারা কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কর্মে নিয়োজিত। কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হয়েও এখনো তারা কৃষিশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি।

বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রায় ৯০ শতাংশ নারী নিয়োজিত আছে। কিন্তু কৃষিখাতে নিয়োজিত নারীর মধ্যে প্রায় ৯৪.৮ শতাংশ নারীই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকে[৬]। অন্যদিকে শিল্পখাতেও নারীরা পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পেয়ে থাকে। একইভাবে উচ্চপদে এবং সরকারি চাকুরিতেও অল্পসংখ্যক নারী সদস্য নিয়োজিত আছে।

পুনরুৎপাদনমূলক কার্যক্রম

নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তারা ঘরে থাকবে, ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করবে এবং ঘরের বিভিন্ন কাজ তদারক করবে। ঘরের রান্নায় শতভাগ কাজ করে নারীরা। কাপড় ধোয়ার ৯৮ শতাংশ, ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্নতার ৯৫ শতাংশ, শিশু লালনপালনের ৯৫ শতাংশ কাজে মেয়েরা নিয়োজিত থাকে। এভাবে পুনরুৎপাদনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি। এছাড়া তারা ঘরের কাজে দিনে ৪.৫০-৫.২০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে থাকে। বাংলাদেশের নারীর কাজের পরিবেশ এবং কাজের সুবিধা সন্তোষজনক নয়। সে কারণে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নারীর ওপর থেকে পুনরুৎপাদনমূলক কাজের ভার কমাতে হবে।

সারণি ৪ : পুনরুৎপাদনমূলক কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শ্রম[৭]

পুনরুৎপাদনমূলক কার্যক্রম	**নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ** (শতাংশে)			
	বর্তমানে		যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের আগে	
ঘরের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
	৭	৯৩	৭	৯৩
ধোয়া-মোছা	২	৯৮	২	৯৮
জ্বালানি ও কাঠ সংগ্রহ	২১	৭৯	১৯	৮১
রান্না করা	০	১০০	০	১০০
সন্তান লালনপালন	২৩	৭৭	৩০	৭০
পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা	২৫	৭৫	৩১	৬৯
সন্তানের লেখাপড়া	১০	৯০	৫	৯৫
আঙিনা এবং ঘরের আশপাশ পরিষ্কার করা	৫	৯৫	২	৯৮

[৬] গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান, ডবি- উবিবিট্রাস্ট-হেলথব্রিজ, ২০০৮

[৭] ইসলাম, খান এবং হক ২০০৪, 'Mechanization and its effect in changing pattern of genderwise employment to improve the rural labours livelihood in Bangladesh', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪

পরিসংখ্যান থেকে নির্বাসিত নারীর শ্রম ও ভালোবাসার অর্থনীতি

এখনো পরিসংখ্যানে নারীর অর্থনৈতিক অবদানের তেমন কোনো স্বীকৃতি নেই। পরিসংখ্যানে নারীর কর্মঘণ্টা পুরুষের চেয়ে কম দেখানো হয়। যদিও নারীরা সারাক্ষণই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু বহু ক্ষেত্রেই তাদের কাজের অর্থায়ন হয় না, তাই তাদের কর্মঘণ্টা কম ধরা হয়। আমাদের দেশে সার্বিকভাবেই নারীদের অবদানকে অস্বীকার করা হয়। গ্রামীণ নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা আরো বেশি। বাংলাদেশে প্রায় ১০ শতাংশ পরিবার নারীপ্রধান, যার ৯৫ ভাগই দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং যারা গ্রামে বাস করে। ৭১ শতাংশ গ্রামীণ নারী খাদ্য সংকটের শিকার। ৮৭.৬ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারভুক্ত[৮]। সামর্থ্যের সবটুকু নিংড়ে দিয়েও তাদের এই অবদানের স্বীকৃতিটুকুও জোটে না।

জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর প্রকৃত অবদান কখনো হিসেব করা হয় নি; সংশ্লিষ্ট সরকারি দলিল-
দস্তাবেজেও এসবের স্বীকৃতি নেই। যা স্বীকৃত তা হলো মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপিতে নারীর অবদান মাত্র ২০ ভাগ। অর্থাৎ জিডিপি সৃষ্টি করেন মূলত পুরুষ (জিডিপিতে পুরুষের অবদান ৮০%)। আসলে এ হিসেবটি ভ্রান্ত এবং সম্ভবত ইচ্ছা করেই এ ভুল করা হয়। মূল কথা হলো যা কিছু কল্যাণ সৃষ্টি করে তার সবই জাতীয়/দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। যে নারী তথাকথিত উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় অর্থাৎ শিল্প, সেবা খাত ও কৃষিতে শ্রম বিনিয়োগ করে তার শ্রমমূল্য জিডিপিতে হিসেব করা হয়। কিন্তু যে নারী শত ধরনের গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে শ্রম দেয়, যে নারী গ্রামে বাড়ির উঠোনে ধান শুকানোসহ বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত কাজে শ্রম দেয়, যে নারী খানার শিশু ও প্রবীণদের সেবাযত্ন করে— তার শ্রমসময়ের অর্থমূল্য জিডিপিতে যোগ হয় না। বলা হয়, নারীরা তো এসব কাজ করবেই; এসব কাজ করার জন্যই তো নারীর জন্ম। বলা হয়, নারীরা এসব করে ভালোবেসে— এই হলো ভালোবাসার অর্থনীতি। ভালোবেসে বাংলাদেশের ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী নারীরা গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে বছরে ব্যয় করে ১৬ হাজার ৬৪১ কোটি শ্রমঘণ্টা[৯]।

বাংলাদেশে নারীর ভালোবাসার অর্থনীতির বার্ষিক অর্থমূল্য আনুমানিক ২,৪৯,৬১৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের নারীর অংশ ৭৯ ভাগ আর শহরাঞ্চলের নারীর অংশ ২১ ভাগ। সুতরাং এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশের জিডিপিতে নারীর অবদান ২০ শতাংশ নয়, প্রকৃত অবদান কমপক্ষে ৪৮ শতাংশ[১০]।

নারীর গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের দাবি

বাংলাদেশে নারীর গার্হস্থ্য কাজকে এখনো মূল্যায়ন করা হয় না। এটি মূল্যায়ন করা হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে আরো অনেক বাড়ত। নারীর গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতির বিষয়টি এখন গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। এ বিষয়ে দেশ-বিদেশের নারী আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরেই সচেতন রয়েছে এবং গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতির দাবি তুলে ধরেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গৃহস্থালি কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হবে কি শুধু গৃহবধূদের জন্য (ইংরেজিতে যাদের হাউসওয়াইফ বলা হয়), নাকি যারা গৃহস্থালি কাজ করে তাদের সবার জন্য? গার্হস্থ্য কাজ শুধু একজন বিবাহিত নারী, যার স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরে পরিবারের বিভিন্ন বয়সী সকল নারীকেই গার্হস্থ্য কাজ করতে হয়। এর পরিমাপ করা সহজ নয়। এ কথা সবারই জানা, গৃহবধূ বলতে সাধারণত তাদেরই বোঝায়, যারা বিবাহিত আছেন বা ছিলেন এবং যাদের গৃহকাজের সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। এটি অনেকের জন্য ফুলটাইম কাজ, আবার কারো কারো জন্য সময়ের মাপে হাফটাইম। কারণ, তারা একইসঙ্গে বাইরের শ্রমবাজারের সঙ্গেও যুক্ত। একক পেশা হিসেবে যেকোনো দেশে 'গৃহবধূ' বা 'হাউসওয়াইফ' হিসেবে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নারী পাওয়া যাবে। এমনকি পাসপোর্ট করতে গিয়ে নারীদের পেশা অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গৃহবধূ হয়ে হয়ে যায়, যদি না সচেতনভাবে কেউ নিজেকে শ্রমিক কিংবা কৃষক হিসেবে পরিচয় দিতে চায়।

বাংলাদেশে ২০০৭ সালের হিসেবে ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ নারী বিবাহিত, বিয়ে হয় নি ২৭ দশমিক ৩ শতাংশের এবং বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত ১০ দশমিক ৪ শতাংশ[১১]। বৈবাহিক যে অবস্থানেই থাকুক না কেন এবং যে বয়সেই থাকুক না কেন, গৃহকাজ নারীকে করতেই হয়। শুধু কাজের ধরন ও মাত্রার পার্থক্য হতে পারে (নারী আন্দোলনের অনেকেই অবশ্য 'গৃহবধূ' শব্দটি ব্যবহারের বিপক্ষে, কারণ তাদের মতে, বিয়েটা হয় গৃহের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে নয়! এক্ষেত্রে তারা 'গৃহ

---

[৮] ইউনিসেফ, চাইল্ড পোভারটি অ্যান্ড ডিজপারিটিস ইন বাংলাদেশ ২০০৯, এ রিসার্চ স্টাডি টুওয়ার্ডস গে- াবাল স্টাডি অন চাইল্ড পোভারটি অ্যান্ড ডিজপারিটিস

[৯] আবুল বারকাত, বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : জাতীয় মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে, ২৮ এপ্রিল ২০০৮ প্রিপ ট্রাস্ট এবং অক্সফাম জিবি আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় উত্থাপিত

[১০] আবুল বারাকাত, প্রাগুক্ত

[১১] BBS, Sample Vital Registration System, 2007, Gender Statistics of Bangladesh

ব্যবস্থাপক' কথাটি ব্যবহারের পক্ষে, কারণ তারা গৃহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে।)

আমাদের দেশে নারীরা যখন শ্রমবাজারে আসে, তখন তাকে সস্তা শ্রমিক বানানো হয়। এটা মনে রাখা দরকার যে, নারীশ্রমিক এবং সব ধরনের কর্মজীবী নারী একই সঙ্গে গৃহকাজেও জড়িত। তাদের ভোরবেলা উঠে আগে পরিবারের সবার খাবারের ব্যবস্থা করে নিজে খেয়ে না-খেয়ে ছুটতে হয় কাজে। অথচ এই নারীশ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেয়া হয় না, তাদের ক্ষেত্রে মজুরিবৈষম্য করা হয়। গৃহকাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করলে নারীশ্রমিকদের মজুরি দ্বিগুণ হওয়া উচিত। কারণ, তারা একইসঙ্গে গৃহকাজও করে আসছে, কিংবা তার কাজটুকু করে দেয়ার জন্য তাকে কাজে সহায়তা করতে গৃহশ্রমিক নিয়োগ দিতে হচ্ছে। দেখা গেছে, দেশের জাতীয় আয় নিরূপণের ক্ষেত্রেও গৃহের ভেতরে নারীর কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। বিশিষ্ট নারীবাদী লেখক ক্যারোলাইন শ্যো বেল যথার্থই বলছেন, মূলত সেই সব কাজই মূল্যায়ন করা হয়, যা বাজারে আসে এবং যার আর্থিক দাম ধার্য করা হয়। এখানে শুধু নারীদের কাজই নয়, গ্রামীণ এবং শহরের বাজার-বহির্ভূত অনেক পুরুষের কাজও বাদ পড়ে যায়।

উপসংহার

দারিদ্র্য সবার আগে আঘাত করে নারীকে। পৃথিবীতে নারীই সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যের শিকার হয়। পুরুষরা ফাঁকি দিতে পারে, পালিয়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু নারী পারে না। নারীই সংসারের সবাইকে সামলায়। সংসারে শিশু কিংবা বয়স্ক সদস্যের খাবারের ব্যবস্থা নারীকেই করতে হয়। খিদে লাগলে সন্তান মায়ের কাছেই আবদার করে। মা নিজে না-খেয়ে হলেও স্বামী এবং সন্তানের খাবারের ব্যবস্থা করে। অভাবের দিনে কখনো কখনো স্বামীও নিখোঁজ হয়ে যায়। বাবা তার অভুক্ত সন্তানদের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মা পারে না। মাকে অভুক্ত সন্তানদের মুখে আহার জোগানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। খুব সংগত কারণেই তাই নারীকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। নারীরা ঘরে যে কাজ করে তা অন্য কারো মাধ্যমে মজুরির বিনিময়ে করালে নিঃসন্দেহে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো। পুরুষরা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে ঘরের বাইরে কাজ করতে পারত না। তাহলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কোনোটাই ঠিকভাবে চলত না। কাজেই নারীর শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন এবং অতিরিক্ত কাজের বোঝা কমাতে জাতীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক প্রণীত পিআরএসপিতে সুস্পষ্টভাবে নারীর গৃহস্থালি কাজের অর্থমূল্য নিরূপণের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু কীভাবে এই হিসেব করা হবে বা করা যেতে পারে, ওই দলিলে তা উল্লিখিত হয় নি। আমাদের মনে হয়, পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে শ্রেণি ও অবস্থানের ভিত্তিতে নারীদের কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নারীর কাজের অর্থমূল্য বের করা সম্ভব। তবে এ মুহূর্তে যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত, সেগুলো হলো :

- পরিবারে ও সমাজে গৃহস্থালি কাজের মাধ্যমে নারীদের রাখা অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও নীতি-নির্ধারকদের সচেতন করা;
- নারীর অমূল্যায়িত বা বাজার-বহির্ভূত (গৃহস্থালি) কাজের সঠিক মূল্য জিডিপির হিসেবে যোগ করা;
- রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থকে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা;
- গৃহস্থালি কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা; জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজনের প্রচলিত প্রথা পরিবর্তন করা। আমাদের সমাজে গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী নারীর কাঁধেই সাংসারিক সকল কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেসব নারী বাইরে চাকরি করে তাদেরও ঘরে ফিরে গৃহস্থালি কাজ করতে হয়। কিন্তু পুরুষরা সাধারণত গৃহস্থালি কাজে অংশগ্রহণ করে না। অত্যধিক কাজের চাপ নারীর মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এজন্য জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজনপ্রথা বদলানোর মাধ্যমে নারীর ওপর থেকে গৃহস্থালি কাজের চাপ কমানোর কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে নারীদের ওপর গার্হস্থ্য কর্মের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব না-চাপিয়ে পুরুষদেরও গৃহস্থালি কাজে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও এবং গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- এ ব্যাপারে জাতীয়ভিত্তিতে আরো ব্যাপক ও বহুমাত্রিক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

নারীদের মজুরিবিহীন কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রচলিত জাতীয় আয় বা মোট দেশজ উৎপাদনের পরিসংখ্যানকে শুধু সমৃদ্ধই করবে না, জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে চিহ্নিত করবে। জাতীয় আয় বা মোট দেশজ উৎপাদনের জাতীয় পরিসংখ্যানকে পুনর্বিবেচনায় আনতে পারলে, নারীর শ্রমকে আর অদৃশ্য গণ্য করা হবে না। মজুরিবিহীন কর্মকাণ্ড বা বাজার-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে অধিকতর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের যুক্তিটি আরো দ

়ঢ় হয়ে উঠবে। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং নারীসমাজের জন্য সমতা ও উন্নয়ন লাভের প্রশ্নটির ভিত্তিও অনেকাংশে শক্ত করা সম্ভব হবে।

তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কেবল গার্হস্থ্য কাজে নারীর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন দিয়েই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে না। নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা এবং যেখানে তার ন্যায্য মজুরি পাওয়ার বিষয় আছে, সেখানে ন্যায্য মজুরি দেওয়া, মজুরিবৈষম্য না-করার জন্যও কাজ করতে হবে। অর্থাৎ শুধু জিডিপিতে নারীর অবদান দেখানোর জন্য পরিসংখ্যানচর্চার কথায় খুশি হওয়া যাবে না, নারীর এই অবদানের মূল্য আমরা কীভাবে পরিশোধ করব, সেটাই হওয়া উচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

নারীর ঘামে ভেজা শ্রমে সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের পরিবার। গ্রাম ও শহরের সব শ্রেণির নারী গার্হস্থ্যকর্মে তাদের শ্রম দিয়ে যাচ্ছে নীরবে। সময় এসেছে তাদের এ কাজের জন্য মূল্য পরিশোধের।

চিররঞ্জন সরকার সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com